

বর্ষায়ন ২০১৮
৫ জানুয়ারি শুক্রবার

সপরিবারে অংশ নি

শুকরিয়া ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলের ২৫টি বছর শেষে ২০১৮-তে ২৬ তম বছরে পা রাখবে কোয়ান্টাম মেথড। এ বছর ৫ জানুয়ারি শুক্রবার দেশে ও দেশের বাইরে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা উদযাপন করবেন কোয়ান্টাম বর্ষায়ন।

সবাই যেন সপরিবারে বর্ষায়নের আনন্দ-আয়োজনে শরিক হতে পারেন, এজন্যে বছরের প্রথম ছুটির দিনটিকেই বেছে নেয়া হয়েছে বর্ষায়ন উদযাপনের লক্ষ্যে। পরিবার-বিচ্ছিন্নতা ও অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে সপরিবারে সার্বজনীন অংশগ্রহণে নতুন বছর শুরু করার ক্ষেত্রেও এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে কোয়ান্টাম।

নতুন বছরের প্রথম শুক্রবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দেশজুড়ে বিভিন্ন পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এজুয়েট, প্রো-মাস্টার, এসোসিয়েটসহ কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা একত্রিত হবেন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।

সাফল্য ও প্রশান্তিময় আগামী বছর কামনায় এদিন বর্ষায়ন শুরু হবে সুখী জীবনের মেডিটেশন দিয়ে। মেডিটেশন ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর বাঙালির ঐতিহ্যবাহী খাবার পিঠাপুলি ও মোয়া দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে। এছাড়াও বর্ণিল সাজে সাজানো হবে দেশব্যাপী ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো।

বর্ষায়নের বার্তা পৌছে দিতে ইতোমধ্যেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা শুরু করেছেন চারপাশে ৪০ ঘরে প্রতিবেশীদের সাথে সংযোগায়ন। বর্ষায়নে আগত অতিথিদের উপহার হিসেবে দেয়া হবে নতুন বছরের পকেট ক্যালেন্ডার।

শুধু দেশেই নয়, দেশের বাইরেও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা বর্ষায়নকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করছেন নানারকম প্রস্তুতি। তারাও বর্ষায়ন উদযাপন করবেন চিরন্তন বাঙালি ঐতিহ্য ও রীতিতে।

কোয়ান্টামের ২৬ তম বছরে নতুন কর্মোদ্যম আর অফুরান প্রাণশক্তিতে ইতিবাচকতা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। রাগ-শোক, ভ্রান্তবিশ্বাস আর সমস্ত নেতিবাচকতা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে চারপাশের সকলকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের সুরে একাত্ম করতাই মূলত এই আয়োজন।



বয়স ১৮ হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না

আপনার সন্তানের বয়স ১৮-এর কম হলে তার হাতে স্মার্টফোন তুলে দেয়ার ব্যাপারে সাবধান! কারণ এটি হতে পারে তাকে ক্রমান্বয়ে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়ার মতো আত্মঘাতী একটি পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-পর্যবেক্ষণ শেষে বিশ্বজুড়ে সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, স্মার্টফোন আসক্তি ও মাদকাসক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। এ দুটো একই রকম ক্ষতিকর। তাই তাদের পরামর্শ হচ্ছে, সন্তানের বয়স ১৮ হওয়ার আগে কোনোভাবেই তার হাতে স্মার্টফোন তুলে দেবেন না।

সচ্ছল-অসচ্ছল নির্বিশেষে পরিবারগুলোতে ইদানীং দেখা যায়, বড়দের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া শিশু-কিশোররাও হরদম স্মার্টফোন ব্যবহার করছে। অনেক অভিভাবক আবার একে আধুনিকতাও মনে করেন যে, আমার এত ছোট বাচ্চাও স্মার্টফোন ব্যবহার করতে জানে! তাই তারা সচেতনভাবেই সন্তানের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেন। কিন্তু নিজের সন্তানের জন্যে এর চেয়ে ভুল পদক্ষেপ আর কিছু হতে পারে না।

কারণ স্মার্টফোনের মতো আধুনিক প্রযুক্তিপণ্যগুলো এতটাই আসক্তিপ্রবণ যে, তা নানাভাবে প্রাণসংহারী হয়ে উঠতে পারে। আর এসব প্রযুক্তিপণ্যের উদ্ভাবক দেশগুলোই এখন এর সবচেয়ে বড় শিকার। ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু-কিশোরদের স্মার্টফোন-আসক্তির প্রতিকার করতে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে এখন খোলা হয়েছে একাধিক স্মার্টফোন রিহাব সেন্টার! শঙ্কিত মা-বাবারা তাদের আসক্ত সন্তানদের এসব সেন্টারে নিয়ে ভর্তি

করাচ্ছেন-ঠিক যেমন মাদকাসক্ত সন্তানের উৎকর্ষিত অভিভাবকরা করে থাকেন।

এ পরিণতি আঁচ করতে পেরেই বিল গেটস ও স্টিভ জবসের মতো প্রযুক্তি জগতের কর্ণধারা স্ব-উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি থেকে সচেতনভাবেই নিজেদের সন্তানদের দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও পৃথিবীব্যাপী কোটি পরিবারে অবাধে পৌছে দিয়েছেন ট্যাব-আইপ্যাড-স্মার্টফোনের মতো আসক্তি-সৃষ্টিকারী প্রযুক্তিপণ্য।

এ প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সন্তানের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেয়া তার হাতে মাদক তুলে দেয়ারই শামিল। যার নিশ্চিত পরিণতি হতে পারে বিভিন্ন মনোদৈহিক জটিলতা এমনকি আত্মহত্যা। যার ফল মর্মান্তিকভাবে ভোগ করছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ এবং ওদের পরিবারগুলো।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন আমাদের নিজেদের পরিবার ও সন্তানদের বাঁচাতে আশু সচেতনতা বিশেষভাবে জরুরি।

তাই আমাদের প্রত্যাশা-১৮ বছর হওয়ার আগে কাউকে যেমন সাবালক হিসেবে গণ্য করা হয় না, এ সময়ের আগে বিয়ে যেমন সংবিধান মতে শাস্তিযোগ্য

অপরাধ, তেমনি বয়স ১৮ হওয়ার আগে শিশু-কিশোরদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দেয়াও যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আসুন, আমাদের পরিবার ও প্রিয় সন্তানদের সুস্থ সুন্দর আলোকিত জীবনের স্বার্থে আমরা প্রার্থনা করি-সরকার যেন বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং এ মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেন।

মাটির ব্যাংক করসেবা
১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর

সালতামামি উৎসব ২০১৭

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সালতামামি উৎসব। এ উপলক্ষে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা।



বছর শেষের এই উৎসবমুখর করসেবায় দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। সারা বছরে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের কাছে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন ব্যাংক পৌছে দেয়াই এ করসেবার লক্ষ্য। আর সেইসাথে সবাইকে জানানো হবে আসন্ন বর্ষায়নের আমন্ত্রণ।

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্রিত করতে পারলে সম্ভবদ্বাভাবে অনেক বড় কাজ করা সম্ভব-এ বিশ্বাস নিয়েই ১৯৯৮ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু। সেই থেকে কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্য, সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা এ সম্ভবদ্বা দানে অংশ নেন।

দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ফাউন্ডেশন এ অর্থ ব্যয় করে আসছে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সেবায়। বান্দরবান লামায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে ১৭শ শিশু।

এছাড়াও ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম। যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র প্রসূতিকে চিকিৎসা পরামর্শ ও পুষ্টি সেবা, দাফন ও সৎকার, খতনা, ত্রাণ কার্যক্রম, গৃহনির্মাণ এবং স্বনির্ভরায়ন অন্যতম।

তাই কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান পরিণত হোক আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে। বরকতময় হোক আমাদের নতুন বছর।

কোয়ান্টাম মেথড

৪৩৮ তম কোর্স ৥ ঢাকা

১৯, ২০, ২১ ও ২২ জানুয়ারি
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বেশি কথা মোবাইলে কান যাবে অকালে

অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত

সুইজারল্যান্ডের জুরিখের একটি স্কুল। বছর চারেক আগে সে স্কুলের শিক্ষার্থীরা হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল। শিক্ষকরাও যেন কিছুটা বদমেজাজি ও খিটখিটে হয়ে উঠলেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে এর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। পরবর্তীতে জানা গেল, স্কুল-সংলগ্ন মোবাইল ফোনের অতিকায় টাওয়ার থেকে নির্গত রেডিয়েশনই এর কারণ, যা মানব মস্তিষ্কের সহায়ক অণুজীবের অতিত। মোবাইল কোম্পানির নামে মামলা হলো। বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে টাওয়ার সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো তারা।

আমাদের দেশেও এখন বাছ-বিচারহীনভাবে মোবাইল টাওয়ার বসানো হচ্ছে। জনসংখ্যা-অনুপাতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর সর্বোচ্চ মোবাইল ব্যবহারকারীর দেশ! গাড়ি চালাতে চালাতে বা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফোনে কথা বলছে, এমন দৃশ্য আজকাল অহরহই দেখা যায়। সাথে মরণঘাতী সেলফির হুজুগ তো আছেই। প্রশ্ন হলো, মোবাইল ফোন ব্যবহার কি বিপদজনক? আমি বলব, এটা আসলে বিপদজনকের চেয়েও বেশি কিছু।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, একটি মোবাইল ফোন মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সমপরিমাণ রেডিয়েশন ছড়িয়ে থাকে। ১৫ মিনিট একটানা মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন বাড়তে থাকে। ফলে কান-সংলগ্ন ত্বক আগুনের মতো লাল হয়ে যায়। কান গরম হয়ে যায়, শুরুর হয় মাথাব্যথা।

এখানেই শেষ নয়। এর সাথে আছে এন্টেনার রেডিয়েশন, যা মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট অবধি। আমরা জানি ১০১ ডিগ্রিতেই শিশুদের খিচুনি হয়। তাহলে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা যখন ১০৩ ডিগ্রিতে ওঠে তখন তার টিস্যুগুলোর কী অবস্থা হচ্ছে-ভেবে দেখুন একবার! কী পরিমাণ খিচুনি ওখানে হচ্ছে!

ভারতের টেলিযোগাযোগ ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার প্রণীত খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, বেজ স্টেশনের এন্টেনা থেকে নির্গত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের প্রভাবে মারাত্মক ক্ষতির শিকার হন ১৬ বছরের কম বয়সী শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা নারীরা। বাচ্চা খেতে না চাইলে অনেক মা মোবাইলে কিছু একটা চালু করে দেন। বাচ্চা গুটা একঘণ্টা ধরে দেখতে থাকে আর মা তাকে খাইয়ে দেন। কিন্তু তিনি খেয়াল করেন না যে, সন্তান এই একঘণ্টা ধরে রেডিয়েশনও হজম করছে। অর্থাৎ পুষ্টি যতটুকু নিচ্ছে তার চেয়ে অপুষ্টি নিচ্ছে বরং বেশি। দীর্ঘ গবেষণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়স ১৬ হওয়ার আগে কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ব্যবহার করা উচিত না।

সাম্প্রতিক সময়ে অটিজম-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বিশ্বজুড়েই বেড়ে যাচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে। ১৯৮০ সালে যা ছিল প্রতি ৫০০ জনে একজন, এখন সেটা প্রতি ৬৮ জনে একজন! অটিজমে আক্রান্ত শিশু সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ কোরিয়ায়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সে-দেশের বিজ্ঞানীরা দায়ী করছেন

বেশি বয়সে সন্তানধারণ, ঘন ঘন আলট্রাসোনোগ্রাফি ও মোবাইল ফোনের রেডিয়েশনকে।

মোবাইল ফোনে বহু সময় ধরে কথা বললে আপনি অবসন্ন হয়ে পড়বেন, মাথাব্যথা করবে। অনেকক্ষণ কথা বলে ঘুমাতে গেলেন, ঘুম আসবে না। আর বিরামহীনভাবে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাদের স্মৃতিশক্তিও ধস নামে এবং কাঁধ, কনুই ও কব্জির জয়েন্ট ক্রমশ অকেজো হয়ে যায়।

মস্তিষ্কে দেয়ার জন্যে এর চারপাশে 'ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার' নামে একটি আবরণ আছে। অল্প কিছু ছাড়া অধিকাংশ ওষুধই এই দেয়াল অতিক্রম করতে পারে না। এই দেয়ালের জন্যেই

অনেক ওয়েভ ব্রেনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় ধরে মোবাইল ফোনে কথা বলার ফলে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং এর রক্তনালীগুলো সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। রক্তনালীর দেয়ালগুলো তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর মোবাইলের মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশন সরাসরি এন্ডোথেলিয়াল সেলের প্রোটিন কাঠামোকে বদলে দেয়, সে সুযোগে টক্সিন মস্তিষ্কের ভেতরে প্রবেশ করে।

আরেকটি সাধারণ প্রশ্ন হলো, মোবাইলের রেডিয়েশন কি ব্রেন টিউমার সৃষ্টি করতে পারে? টক্সিনের প্রভাবে নার্ভ সেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডিএনএ-র কর্মকাঠামো বদলে যায়। কোনো ডিএনএ যদি একবার অস্বাভাবিক হয়ে যায় তাহলে সে সবসময় অস্বাভাবিক ডিএনএ-ই রেকপিং করতে থাকবে। ফলে ব্রেন টিউমার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

ব্রেন ক্যান্সার সংক্রান্ত বিস্তারিত গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, একজন মানুষ যদি এক থেকে পাঁচ বছর অতিমাত্রায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে তার ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ১২৫ শতাংশ। পাঁচ থেকে ১০ বছর ব্যবহার করলে সম্ভাবনা বাড়বে ২৫০ শতাংশ। আর যারা ১৫ বছর ধরে ব্যবহার করছেন তাদের সম্ভাবনা বাড়বে ২৭৫ শতাংশ পর্যন্ত।

একজন ইএনটি সার্জন হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা হলো, গত কয়েক বছরে কানের পার্শ্ববর্তী ক্যারোটাইড ও স্যালাইভা গ্ল্যান্ডের টিউমার বাংলাদেশে বহুগুণ বেড়ে গেছে। এর পেছনেও আছে মোবাইল ফোনের ভূমিকা। তাই আমি বলি, বেশি কথা মোবাইলে, কান যাবে অকালে।

এখন করণীয় কী? প্রথমত, মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময়সীমা কমিয়ে দিতে হবে। মোবাইলে কারো সাথে আলাপের আদর্শ সময় হলো ২০ সেকেন্ড। কিন্তু তিন মিনিটের বেশি কোনোভাবেই নয়। যদি কেউ তিন মিনিট কথা বলে ফেলেন তাহলে পরবর্তী ১৫ মিনিটের মধ্যে তার আর ফোন ব্যবহার করা একেবারেই উচিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, হেডসেট বা স্পিকার ব্যবহার করুন। অ্যানালগ বা ল্যান্ডফোন যদি হাতের নাগালে থাকে তাহলে সেলফোন ব্যবহার করবেন না। পারতপক্ষে মোবাইল ফোন শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। আবার অনেকে আছেন যারা ঘুমানোর সময় ফোনটি বিছানায় এমনকি মাথার ঠিক কাছের রাখেন, এটা কখনোই করা যাবে না।

তৃতীয়ত, যেখানে-সেখানে মোবাইল ফোনের এন্টেনা বসানো যাবে না। আসলে যে-কোনো ব্যাপারে ব্যক্তিগত সচেতনতাই সবচেয়ে জরুরি। এটা মনে নিতেই হবে যে, মোবাইল ও কম্পিউটার আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। অনেক কাজ আগের চেয়ে বেশ সহজ হয়ে গেছে। আবার এদের আছে অদৃশ্য বিপদ। এই স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলোর ব্যাপারে পূর্বসতর্কতা নিলে আমরা নিরাপদে থাকতে পারব।

অনুলিখিত

মোবাইল ফোন
ব্যবহার কি
বিপদজনক?
আমি বলব, এটা
আসলে বিপদজনকের
চেয়েও বেশি কিছু।

মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো এক স্কুলছাত্র। তার গল্পটা আগে বলে নিই।

কী একটা উপলক্ষে ওদের ক্লাসে একদিন বেশ খাওয়াদাওয়া হলো। সবারই পানির ভেট্টা পেয়েছে। তাই কয়েকটা গ্লাস জোগাড় করে দগুরিকে বলা হলো টিউবওয়েল থেকে জগভর্তি করে পানি এনে দিতে। ক্লাস-ক্যাপ্টেন সেই ছেলেটি নিল সবাইকে পানি খাওয়ানোর দায়িত্ব।

মিনিট বিশেক ধরে চলল এই পানি-পান পর্ব। দগুরি জগভর্তি করে পানি এনে দিচ্ছে, ছেলেটি সেই জগ হাতে সহপাঠীদের কাছে গিয়ে গ্লাসে পানি ঢেলে দিচ্ছে। সবার খাওয়া শেষ হলে ছেলেটি গিয়ে বসে পড়ল তার বেঞ্চিতে।

আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা অতি সামান্যই।

কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ যে অপার্থিব শিহরণ ছেলেটি অনুভব করল, সেটি তার জীবনে এই প্রথম। জীবনে প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল-চাইলে সে-ও অন্যের জন্যে কিছু করতে পারে! ক্লাসে প্রথম হয়ে কিংবা ক্লাস-ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় সবার স্নেহ ও সমীহ জোট বটে, কিন্তু তার চেয়েও এক অলৌকিক আনন্দ আর সুখ মেলে পরার্থে কিছু করতে পারায়। এই সুখানুভূতির তোড়ে নিজের ছোটখাটো খেদ-দুঃখ রাগ-অভিমান কোথায় যে মিলিয়ে যায়!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ছেলেটি সেদিন বুঝতে পেরেছিল-জগতে তারও একটা ভূমিকা আছে, তারও কিছু দেয়ার আছে পৃথিবীকে।

প্রিয় পাঠক, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বলে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। কথাটা সাধারণত বলা হয়ে থাকে তাচ্ছিল্য অর্থে, কিন্তু সেই দিন বুঝি এবার ফুরাল!

সাম্প্রতিককালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী-মনোবিদদের চমকপ্রদ সব গবেষণা-প্রতিবেদনগুলো বলছে, ঘরের খেয়ে সত্যিই যারা বনের মোষ তাড়াতে পারেন অর্থাৎ কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই চারপাশের মানুষ ও সমাজের কল্যাণে নিয়মিত কাজ করে যান, তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ে ক্রমশ। কমে হতাশা-বিষণ্ণতা-একাকিত্বের অনুভূতি। তাদের পেশাজীবনেও সৃষ্টি হয় অনবদ্য সাফল্য-সম্ভাবনা।

এ প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-এখন থেকে চিকিৎসকদের উচিত সুস্থতার জন্যে রোগীদের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দেয়া।

সেবাকর্মে স্ট্রেস কমে, রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

পেশাগত দায়িত্ব বা কোনো ব্যাপারে কি উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন? স্ট্রেস কি ব্যাঘাত ঘটাবে আপনার দৈনন্দিন জীবনে? নাকি বিষণ্ণতার আক্রমণে আপনি পর্যুদস্ত? ভয় নেই। আছে মোক্ষম সমাধান।

বাসে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন, আপনার পাশেই কি দাঁড়িয়ে আছেন গর্ববতী নারী বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ? আপনার আসনটা তার জন্যে ছেড়ে দিন। অধস্তন ব্যক্তিটি নিত্যদিন আপনাকে আগে সালাম দেন, আজ কি উল্টোটা হতে পারে না?

দিনশেষে ভেতরে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন আপনি নিজেই টের পাবেন। এই যে অন্যের তরে সাধ্যমতো কিছু করলেন, একটুখানি দিলেন, ওই ‘দেয়া’টুকুতেই সুখ, তাতেই জীবনের অর্থপূর্ণতা। কারণ একটু একটু করেই একসময় মানুষ অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে বড় কিছু দিতে। সজ্ঞবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে।

সাইকোলজি টুডে সাময়িকীর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যের কল্যাণে কাজ করে যে নির্মল



সুখানুভূতি আমরা লাভ করি, তাতে সেরোটিনিন-এন্ডোরফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার ও হরমোনের প্রবাহ বাড়ে, যা বিষণ্ণতা-দুশ্চিন্তার মতো নেতিবাচক আবেগের ঝুঁকি কমায়। সেইসাথে বাড়ায় রোগ প্রতিরোধ শক্তি। সংহত হয় আবেগীয় ভারসাম্য। দেহ-মনকে করে চনমনে ও গতিময়।

উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ স্ট্রেস। আর মানবকল্যাণে কাজ স্ট্রেস কমায় বলে এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত এক গবেষণায় এর সত্যতা মিলেছে। তাতে দেখা গেছে, বছরে অন্তত দুশ ঘন্টা স্বেচ্ছাশ্রমে ব্যয় করেছেন এমন স্বেচ্ছাসেবীর রক্তচাপ আগের তুলনায় কমেছে।

এতে নেতৃত্বদানকারী গবেষক রোডলফিয়া স্নিড বলেন, এসব তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের পর শুধু রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যেই এখন অনেকে সেবামূলক কাজের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে কেবল বয়স্করাই উপকৃত হচ্ছেন না। সম্প্রতি কানাডায় ১০ম গ্রেডে পড়ুয়া ১৬০ জন শিক্ষার্থীর ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার পর তাদের কোলেস্টেরলের মাত্রা ও অতিরিক্ত ওজন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

স্মৃতিভ্রষ্টতা ও স্নায়বিক-মানসিক জটিলতার কার্যকর দাওয়াই

গত কয়েক দশকে বার্ষিক্যজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা বা আলঝেইমার্স রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে সারা পৃথিবীজুড়েই। এটি প্রতিরোধের জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনধারা গুরুত্বপূর্ণ বটে, তার পাশাপাশি সেবামূলক

কাজে সময় দেয়ার মাধ্যমেও আপনি এ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকদেরই পরামর্শ এটি।

বার্ষিক্যবিষয়ক চিকিৎসা-সাময়িকী *জার্নাল অব জেরোন্টোলজি*-তে গবেষকরা বলেছেন, সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানব মস্তিষ্কের স্থিতিস্থাপকতায় ঘটে ইতিবাচক পরিবর্তন। আন্তঃনিউরোন সংযোগ বাড়ে মস্তিষ্কে। কমে আলঝেইমার্সের ঝুঁকি। ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে এভাবেই বার্ষিক্যজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

আছে আরো চমকপ্রদ তথ্য। সেবাবর্মে নিবেদিত একদল বয়োবৃদ্ধ নান-এর মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে গবেষকরা দেখেন, এক-তৃতীয়াংশের মস্তিষ্কই ছিল আলঝেইমার্সের উপসর্গ-আক্রান্ত। কিন্তু মজার ব্যাপার, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম যেমন : শিশুদের পড়ানো, জটিল ধাঁধা সমাধান এমনকি গাড়ি চালিয়ে রোগীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার কাজেও ওরা ছিলেন দারুণ স্বচ্ছন্দ।

এর কার্যকারণ ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, মস্তিষ্ক মানবদেহের এমন একটি বিস্ময়কর অঙ্গ-যার কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত বা অকেজো হলেও সে ঠিকই তার অক্ষত অংশটুকু দিয়ে কোনোভাবে কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম-যদি সে ব্যক্তির সামনে থাকে নিত্যনতুন কর্মচাপস্রোত, চ্যালেঞ্জ ও কর্মপরিকল্পনা।

আর এ ধরনের কাজের সুবাদে পরিচিতির গণ্ডিটা বড় হয় বলে গড়ে ওঠে একটা সত্যিকারের সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন নতুন সম্পর্কের উষ্ণতায় মানুষ ক্রমান্বয়ে মুক্তি পায় পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারের মতো (অতীত কোনো তিক্ত স্মৃতি বা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট) বিভিন্ন মনোদৈহিক ও স্নায়বিক জটিলতা থেকে।

সেবায় তৃপ্তি ও সাফল্য, পরার্থপরতায় সুখ

২০১২ সালে যুক্তরাজ্যের ‘রয়াল ভলান্টারি সার্ভিস’ পরিচালিত গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, সজ্ঞবদ্ধ সেবাকার্যে উৎসাহী মানুষেরা পরিণত বয়সে বিষণ্ণতা ও সামাজিক একাকিত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকেন। তুলনামূলকভাবে এরা হন তৃপ্ত ও প্রশান্ত। সেবাব্রতী মানুষদের জীবনমানেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করেছেন গবেষকরা।

সামাজিক কল্যাণে বিভিন্ন সেবা-কার্যক্রমে যারা সময় ও শ্রম দেন, তারা হন অধিকতর আত্মবিশ্বাসী ও মানসিকভাবে সক্ষম। নানা কাজের অভিজ্ঞতায় উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলোও তারা সামলে নিতে শেখেন দ্রুততর দক্ষতায়। গবেষকরা বলেছেন, এটি পেশাগত সমৃদ্ধিতেও রাখে দারুণ ভূমিকা।

শৈশবে এমন কাজের সুযোগ-পরিবেশ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে উচ্চতর মূল্যবোধ গড়ে দেয়। এ কারণেই বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ওদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবার অভিজ্ঞতা আছে এমন শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

তাই আসুন, সাধ্যমতো আমরাও নিবেদিত হই সৃষ্টির সেবায়, মানুষের কল্যাণে। পরার্থপরতার মধ্য দিয়েই খুঁজে নিই জীবনের সার্থকতা। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেবা-উদ্যোগগুলো আরো গতিশীল হয়ে উঠুক আমাদের আন্তরিক শ্রম, সময় ও অর্থে। আমাদের সজ্ঞবদ্ধ সেবা-প্রচেষ্টায় আলোকিত হোক লক্ষ দুঃস্থ-বঞ্চিতের জীবন।

তথ্যসূত্র : হার্ভার্ড হেলথ ব্লগ, *জার্নাল অব মেডিকেল এসোসিয়েশন পেডিয়াট্রিকস*, *দ্য আটলান্টিক* ও *হাফিংটন পোস্ট*

বিশ্বাসের কথাই অনুরণিত হয়েছে এ কোর্সে

আনোয়ারা বেগম



আমার মেয়ের উৎসাহে আমি এ কোর্সে অংশ নিয়েছি। এখানে আসার আগে দুই-আড়াই মাস ধরে আমার পিঠে ব্যথা অনুভব করছিলাম। সবসময় মনে হতো, পিঠে কিছু একটা চাপ দিয়ে আছে। তৃতীয়

দিন নিরাময়ের মেডিটেশনে আমি খুব আকৃতি নিয়ে চাইলাম, আমার সব ব্যথা-বেদনা ভালো হয়ে যাক। পিঠের ব্যথার কথা আমি একদম ভুলে গেলাম।

আশ্চর্য হলেও সত্য, পরে অনুভব করলাম, কখন আমার পিঠের ব্যথা ভালো হয়েছে আমি নিজেও জানি না। এটা আমাকে অবাক করে দিয়েছে। এটা অবশ্যই আল্লাহর রহমত।

আমি এতদিন ভাবতাম যারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে সুস্থ হওয়ার কথা বলে, তাদেরকে এ কথাগুলো শিখিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম এগুলো শেখানো কথা নয়, এগুলো মানুষের অন্তরের কথা।

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, কখনো বিশ্বাস হারানো যাবে না। বিশ্বাস এবং ধৈর্য—এ দুটো জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। কোর্সেও বিশ্বাসের কথাই বার বার অনুরণিত হয়েছে। আমার আরো বেশি ভালো লেগেছে যে, এখানে যারা সেবা দিচ্ছেন, তারা সবার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করেন এবং সবাইকে সমান চোখে দেখেন।

[জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব]

এখানে আসাটাই জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত

মো. ফজলে রাব্বী আলিফ



দুর্ভাগ্যবশত আমার জেএসসি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেটে আমার মা-বাবার নাম ভুল এসেছিল। দুটো পরীক্ষাতেই আমি জিপিএ ফাইভ পেয়েছি কিন্তু সার্টিফিকেটে ভুল আসার বিষয়টি

আমাকে খুব ভীত আর অস্থির করে তুলল। তারপর থেকে আমার মধ্যে সবসময় একটা টেনশন কাজ করত। পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারতাম না। শুধু কান্দতাম আর টেনশন করতাম। ফলে ধীরে ধীরে আমি অসুস্থ হতে লাগলাম, সবসময় মাথায় ও ঘাড়ের ব্যথা অনুভব করতাম।

২০১২ সাল থেকে অনেক চিকিৎসা করিয়েছি কিন্তু কোনো সুফল পাই নি। সুস্থতার আশায় আমার মা আমাকে কবিরাজের কাছেও নিয়ে গেলেন। সবকিছু মিলিয়ে আমি আরো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। একসময় আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম যে, এই রোগও হয়তো কোনোদিন ভালো হবে না, আমি হয়তো আর বাঁচব না।

আমার চাচার অনুপ্রেরণায় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছি। এই চার দিন মেডিটেশন করে আমি অস্থিরতা ও টেনশন থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি এখন অনেক সুস্থ বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে, কোয়ান্টামে আসার সিদ্ধান্তটি আমার জীবনের সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত।

[শিক্ষার্থী, আড়াইবাড়ী ইসলামিয়া সাইদিয়া মাদ্রাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

আমি নতুন করে বাঁচতে শিখলাম

নাসরিন নাহার আঁখি



গত সাত বছরে আমার পরিবারে অভিভাবকদের কয়েকজন মারা গেলেন। কাছের মানুষগুলোর এভাবে চলে যাওয়ায় আমি মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। সবসময় মনে হতো,

আমার মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই।

নিজের ভেতরে মৃত্যুভয় চলে এলো। সবসময় মনে হতো, মৃত্যু যেন আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। যখন ঘর থেকে বের হতাম, দরজা লক করে আবার তাকাতাম—আমি কি আবার ঘরে ফিরে আসতে পারব? রান্না করার সময় মনে হতো, আমি কি এই খাবারটা খেতে পারব? নাকি তার আগেই মরে যাব? কারো মৃত্যুর কথা শুনলে আমি অস্থির হয়ে যেতাম।

সব মিলিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার ব্লাড প্রেসার প্রায়ই কমে যায়, বুক ধড়ফড় করে। অথচ অনেকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বলছেন, কোনো সমস্যা নেই।

আমার স্বামীর উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। এখানে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি শিখলাম, যা অবশ্যই ঘটবে, তা নিয়ে আমি ভয় পাব কেন? আমি যতদিন এই পৃথিবীতে থাকব, ততদিন আমি সাহস নিয়ে, প্রশান্তি নিয়ে বাঁচব।

কোর্সে আসার আগে কোনো ফোন এলেই আমি সবসময় আতঙ্কে থাকতাম, হয়তো কেউ বলবে যে, আমার মা অসুস্থ। এখানে এসে উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ যখন সময় নির্ধারণ করেছেন, আমরা যে-কেউ চলে যেতে পারি। কিন্তু যতদিন মা বেঁচে আছেন, আমি চাই তাকে আমার সেবা ও ভালবাসা দিয়ে পরিপূর্ণ করে রাখতে। এখানে এসে মনে হচ্ছে, আমি নতুন করে বাঁচতে শিখলাম।

আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই অনেক হতাশা রাগ ক্ষোভ বিষণ্ণতা জমে থাকে। দুনিয়াতে কেউ এসব দুঃখকষ্ট আর আবর্জনা নেয় না। কিন্তু এই আবর্জনা থেকে আমাদেরকে বের করার জন্যে গুরুজী কোয়ান্টাম মেথড কোর্স শুরু করেছেন। কোয়ান্টাম বলে যে—এসো, তোমার দুঃখ-কষ্ট নেতিবাচকতা মন থেকে ফেলে দাও আর নিয়ে যাও সুখ ও সাফল্য।

আমি এখানে সেই সুখ নেয়ার জন্যে এসেছি। কোর্স করে অনুভব করছি, আমার রাগ-ক্ষোভ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

এখন আমি মনে সাহস পেয়েছি যে, নিজেকে এসব নেতিবাচকতার আবর্জনা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। আমি একা হয়তো একটা ব্রিজ কিংবা সাঁকো গড়তে পারব না। কিন্তু একটির পর একটি ইট ফেলে সেই পথ ধরে আমি সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারব, জীবনটাকে সুন্দর করতে পারব।

আমি প্রত্যাশা করি, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ এবং সব প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে যাক। তাহলে চারপাশের সবাই মনের আবর্জনা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

[গৃহিণী]

এখন আরো সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছে নিজেকে

প্রসাদ বিশ্বাস



২০১১ সাল থেকে আমি আইবিএস রোগে ভুগছিলাম। সুস্থ হওয়ার আশায় ঢাকাতে কোনো ডাক্তার, ক্লিনিক, টেস্ট-কিছুই বাদ দেই নি। এ অসুখের কারণে ওজন কমে আমি এত জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম যে, বাড়ির সবাই আমাকে দেখে কান্নাকাটি করত।

কলকাতায় গিয়ে আমি দু-বার ডাক্তার দেখিয়েছি। ডাক্তাররা শুধু টেস্ট দেন আর প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নামের পাশে লিখে দেন—চলবে। সেই চলার যেন কোনো শেষ নেই। ওষুধ খেয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু শরীর আরও খারাপ হচ্ছিল দিন দিন। এরপর আমি চেন্নাই গেলাম এবং বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করলাম। রিপোর্ট সেই একই—আইবিএস।

আমি কৃতজ্ঞ চেন্নাইয়ের সেই ডাক্তারের প্রতি। তিনি সবকিছু ভালোভাবে দেখে কোনো ওষুধ দিলেন না, প্রেসক্রিপশনে শুধু লিখলেন—ইয়োগা। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় মানবিকতা, এর পরিচয় আমি পেয়েছি তার কাছ থেকে। ইয়োগা চর্চার সূত্রেই আমার কোয়ান্টামে আসার সুযোগ হলো।

আমি আরো আগেই কোয়ান্টামের কথা শুনেছি কিন্তু আসা হয় নি। এবার চেন্নাই থেকে ফিরে এসে আমি গুরুজীর কণ্ঠে অডিও ট্র্যাকগুলো শুনে মেডিটেশন চর্চা করতে শুরু করলাম। আমি কোয়ান্টামকে আমার অস্তিত্বের অংশ হিসেবে গ্রহণ করলাম। ধীরে ধীরে আমার সমস্যাগুলোও কমেতে শুরু করল।

তবে পরিপূর্ণ সুস্থতা এবং ভালো থাকার জন্যে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছি। কোর্সে এসে মনে হচ্ছে, আমি যে নিজে নিজে চর্চা করতাম তা ছিল অসম্পূর্ণ। এখানে গুরুজীর আলোচনা এবং মেডিটেশনে বিষয়গুলো আমার কাছে আরো সহজবোধ্য মনে হচ্ছে। আরো জানলাম যে, আইবিএস একটি মনোদৈহিক রোগ এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনচারণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনোদৈহিক রোগগুলো থেকে নিরাময় লাভ করা সম্ভব। কোর্সের চার দিন পর নিজেকে এখন আরো সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছে।

[ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, কুষ্টিয়া]

সুস্থতা ও সুখী পরিবারের জন্যেই মেডিটেশন

মোহাম্মদ মাসুদ মিয়া শিকদার



প্রায় তিন মাস আগে হঠাৎ আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায় এবং একটা মাইন্ড স্ট্রোক হয়। এরপর থেকে আমি ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে চলছি। এরপরও কোর্সে আসার কয়েকদিন আগে

আমার আবার স্ট্রোক হয়। আমার শারীরিক অবস্থা তখন এমন ছিল যে, বড় বড় দুটি হাসপাতাল আমাকে ভর্তি না করে ফিরিয়ে দিল।

পরবর্তীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো কিন্তু আমি বাম হাত ও বাম পা নাড়াতে পারছিলাম না। ডাক্তার বলে দিলেন ফিজিওথেরাপি চলবে। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। যেদিন আমাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হলো, তার পরদিনই আমি এক ভাইয়ের উৎসাহে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম।

কোর্সে এসে আমার ভেতর বিশ্বাস কাজ করছে— আমি পারব। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, মেডিটেশন করে কোনো ফিজিওথেরাপি ছাড়াই এখন আমি আমার হাত-পা সুন্দরভাবে নাড়াতে পারি। আমার বিশ্বাস, রোগমুক্তির জন্যে সুখী পরিবারের জন্যে মেডিটেশন চর্চা আমাদের সবার প্রয়োজন।

[এল্লিকিউটিভ অফিসার, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি., ঢাকা]

এবার জয় হবে আমার ইচ্ছাশক্তির

ফারহানা আক্তার



ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমি এত ব্যস্ত থাকতাম যে, পরিবারের সবাই পাশে থাকলেও তাদের সাথে কথাই বলতাম না। ফেসবুকে সেসব বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, যারা

কোনোদিন আমার বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে কিনা আমি জানি না। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমি খুঁজছিলাম কিন্তু কোথাও তা পাচ্ছিলাম না। কোর্সে এসে আমি সমাধানের পথ পেলাম।

আমি উপলব্ধি করেছি, গুরুজীর ভাষায় স্মার্টফোন বা শয়তানের বাস্তব নিয়ে আর মেতে থাকা যাবে না। শয়তানের জয় আর হতে দেয়া যাবে না। এবার আমার ইচ্ছাশক্তির জয় হবে।

কোয়ান্টামে আসার আগে আমি ভীষণ ব্র্যান্ড সচেতন ছিলাম। মনে হতো, অমুক ব্র্যান্ডের জিনিস না থাকলে আমার জীবন বৃথা। মেডিটেশন করে মনে হচ্ছে, ব্র্যান্ডের পেছনে ছুটে বেড়ানো অর্থহীন। আল্লাহ আমাকে মহামূল্যবান একটি মন্তির দিয়েছেন এবং এই মন্তিরূপে কাজে লাগিয়েই আমি সবকিছু জয় করতে পারব।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়]

ভুলগুলো শুধরে মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হবো

রত্না সাহা

স্মার্টফোন, বন্ধুবান্ধব আর ফেসবুকে আমি এত আসক্ত ছিলাম যে, মা-বাবা ও পরিবারের কাউকে আমার ভালো লাগত না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অকারণে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম। বন্ধুরা ছাড়া

আমার জীবনে আর কোনো কিছুর গুরুত্ব ছিল না। পড়ালেখাতেও আমার মনোযোগ ছিল না।

এরপর আমার মাসি আমাকে কোয়ান্টামের সাদাকায়ন ও আলোকায়ন প্রোগ্রামে নিয়ে আসেন। প্রথম প্রথম এ প্রোগ্রামগুলোতে ভালো লাগত না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগতে শুরু করে এবং বুঝতে পারি, আমার জীবন গড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোই কোয়ান্টাম বলছে। এই ভালোলাগা থেকেই আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

কোর্সে এসে আমি আমার ভুলগুলো উপলব্ধি করেছি। আর জেনেছি, মা-বাবার মতো নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীতে আর কেউ ভালবাসে না। আর তারা পাশে থাকলে জীবনে সফল হওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আজকের পর থেকে আমি নিজের ভুলগুলো শুধরে মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হয়ে দেখাব।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ]

সুস্থতার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি

মো. শাহরিয়ার শাকিল

আমি গত চার বছর যাবত স্বাস্থ্যকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলাম। শারীরিক-মানসিক সমস্যাগুলোর জন্যে আমি পড়ালেখায় পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি আমার অর্জনগুলোও ধরে রাখতে পারি নি

কখনোই। গত দুই বছর ধরে ইনহেলার নিতে হতো আমাকে। ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেতাম এবং ইনসুলিন নিতাম। ওষুধ ছাড়া আমি রাতে ঘুমাতেও পারতাম না।

কিন্তু কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে মেডিটেশন করে এবং গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি সুস্থতার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি ইনসুলিন এবং ইনহেলার নেয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি ইনহেলার ছাড়াই এখন সুস্থ আছি এবং বেশ ভালো বোধ করছি।

কোনো ওষুধ ছাড়াই যে সুস্থ থাকা সম্ভব, তা এখানে না এলে আমি কখনো জানতে পারতাম না। আমি কোয়ান্টামের সাথে থাকতে চাই এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করতে চাই।

[শিক্ষার্থী, কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি]

মেডিটেশন প্রত্যেকের জন্যেই প্রয়োজন

সুমনা হাসান

কোর্স করার চার দিন আগেও আমার ধারণা ছিল না যে, আমি আবার ভালোভাবে কথা বলতে পারব। তিন বছর আগে হঠাৎ করে একদিন আমার গলায় সমস্যা দেখা দিল। সেদিন সকালে গান গাইতে বসেছি, হঠাৎ

অনুভব করলাম, আমার গলায় প্রচণ্ড চাপ পড়ছে এবং ঠিকমতো আওয়াজ বের হচ্ছে না। আমি গান গাওয়া থামিয়ে দিলাম।

এরপর ছয় মাস ধরে অনেক চিকিৎসা চলতে লাগল। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আমাকে একগাদা ওষুধ লিখে দিচ্ছিলেন কিন্তু আমার গলার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। আমার কোনো হাঁচি কাশি বা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা ছিল না। অথচ আমার ঘাড় ও গলায় এত ব্যথা যে, কাউকে বোঝানো যাবে না।

এরপর আমি দেশের বাইরে গেলাম। সেখানে ডাক্তাররা আমার গলায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, ভেতরে ক্যামেরা ঢুকিয়ে দেখলেন। তারা বললেন, এই রোগের নাম স্প্যাজমোডিক ডিসফোনিয়া এবং এ রোগ হয় অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে। তারা জানালেন, এ রোগের কোনো ওষুধ নেই, এটা শেষ কথা। লাখে হয়তো একজনেরও এ রোগ হয় না কিন্তু আমার হয়েছে, কিছু করার নেই। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম সবই করে যাচ্ছিলাম আর মনে মনে সমাধানটা খুঁজছিলাম।

এরই মধ্যে আমার ছেলে বিবিএ সম্পন্ন করে নিজের উৎসাহে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করল। প্রথমদিন ক্লাস করে বাসায় গিয়েই সে আমাকে উদ্ধুদ্ধ করল মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিতে। কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমার সেভাবে কোনো ধারণা ছিল না। তবে গুরুজীর কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, অনেক বছর আগে থেকে তাকে আমি জানি। আমার বাবা প্রয়াত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানের সাথে গুরুজীর খুব বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

গুরুজীর কাছে মেডিটেশন শিখে সুস্থ হয়েছেন, এমন কয়েকজনের অনুভূতি ইন্টারনেটে দেখে আমার মনে হলো, চার দিনেই তাদের যদি এ অগ্রগতি হতে পারে, তাহলে আমারটাও নিশ্চয়ই ভালো হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি কোর্সে অংশ নিলাম।

কোর্সের প্রথম মেডিটেশনের পরেই আমি ভালো বোধ করছিলাম। আমার আশেপাশের কয়েকজনও বললেন যে, আপনার গলায় পরিবর্তন এসেছে। তখন আমার আত্মবিশ্বাস এলো যে, নিশ্চয়ই সুস্থ হবো। এটা আমার দরকার ছিল।

বুঝতে পারলাম, সমস্যাটা গলায় ছিল না। এতদিন প্রয়োজন ছিল আমার পেশীগুলোকে শিথিল করা, যা আমি পারছিলাম না। কোর্সে আমি শিথিলায়ন শিখলাম এবং নিজেই নিরাময় করতে শিখলাম। এখন আমার কণ্ঠ অনেক পরিষ্কার এবং আমি সুন্দরভাবে কথা বলতে পারছি। আমি মনে করি, কারো রোগ থাকুক বা না থাকুক, তিনি সুখী হোন বা অসুখী—মেডিটেশন প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।

[চোয়ালপারসন, স্টুডিও ২০০০]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার কথার বাধ্য নয়। আমার স্ত্রীর কাছে আমি শান্তি পাই না। আমি তাকে মেডিটেশন করতে পারছি না।

উত্তর : স্ত্রীকে কোনোকিছুতে বাধ্য করবেন না। স্ত্রীকে মমতা দিয়ে বলবেন, যেন তিনি আনন্দের সাথে কাজটা করেন। কারণ মমতাপূর্ণ কথা সবাই শোনে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, আপনার কর্মচারীকে যেভাবে অর্ডার দিয়ে কাজ করান সেভাবে স্ত্রীকে করাবেন, তাহলে ভুল করবেন। আর আজকাল তো ভালোভাবে না বললে কর্মচারীও কাজ করে না।

সবসময় মনে রাখবেন, স্ত্রী আপনার জীবনসঙ্গী। তার সম্মান আপনার সম্মান। অতএব তার সাথে সেই সম্মান ও মনোযোগ দিয়ে কথা বলবেন, হৃদয় থেকে কথা বলবেন।

প্রশ্ন : আমি প্রায় আড়াই বছর আগে জেনেছি আমার গলব্লাডারে পাথর আছে। তখন পাথরের ব্যাসার্ধ ছিল ১৬ মিলিমিটার। আমি নিরাময় মেডিটেশনের মাধ্যমে এই পাথর সরাতে চাই। কীভাবে মেডিটেশন করতে পারি? অটোসাজেশন চর্চায় কীভাবে শব্দ প্রয়োগ করতে পারি?

উত্তর : শারীরিক কোনো বিষয়ে যখন চিকিৎসক সার্জারির পরামর্শ দেন, সেক্ষেত্রে সার্জারি করে নেয়াটা সবচেয়ে ভালো। আর গলব্লাডারে পাথর তো এখন হরহামেশা সার্জারি হচ্ছে। ধরুন, আপনার মাইগ্রেন আছে, নিয়মিত অটোসাজেশনে এটা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ব্রেনের টিউমার তো অটোসাজেশনে যাবে না। আপনাকে সার্জারি করাতে হবে। তবে খোঁজখবর নিয়ে ভালো সার্জনের কাছে যাবেন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও আমরা বলি, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেবেন কিন্তু গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেবেন না। অতএব চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে পদক্ষেপ নেন। সেইসাথে নিয়মিত দান করবেন, সদকা হিলিংয়ে নাম দেবেন ও মেডিটেশন করবেন। অন্যদের যদি সুস্থ হতে তিন মাস লাগে, আপনার লাগতে পারে একমাস। কারণ ধ্যান দোয়া দান দাওয়া নিরাময়কে ত্বরান্বিত করে।

আর সুস্থ থাকার জন্যে নিজের জীবনটাকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসুন। ঘুম থেকে ওঠা, ঘুমানো এবং খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট থাকবে। যখন খাবেন মনোযোগ দিয়ে তৃষ্ণার সাথে খাবেন, নীরবে খাবেন। খাওয়ার সময় নেতিবাচক কথা এবং গীবত বর্জন করবেন। কারণ খাবার আল্লাহর নেয়ামত। শুকরিয়া আদায় করতে করতে খাবেন এবং খাবার গ্রহণের আগে প্রার্থনা করবেন। আর শরীরটাকে ফিট রাখার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করবেন।

আসলে কোয়ান্টাম ব্যায়াম সবাইই করা উচিত। একেকটি রোগ থেকে নিরাময়ের জন্যে নির্দিষ্ট ব্যায়াম রয়েছে। বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করে সেগুলো চর্চা করবেন। কাকরাইলে ওয়াইএমসিএ ভবনের ৫ম তলায় আমাদের কোয়ান্টাম ইয়োগা ক্লাব রয়েছে। সেখানে চলে যাবেন এবং ব্যায়াম করবেন।

আর যারা ঢাকার বাইরে আছেন, ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেলগুলোতে যোগাযোগ করবেন। নিজে নিজে চর্চা করার জন্যে রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটি সংগ্রহ করে নেবেন এবং অনুসরণ করবেন।

প্রশ্ন : আপনার আলোচনা থেকে জান-ই-সদকা দেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। এর পরিমাণ কেমন হতে পারে? আয় যদি কম হয় তাহলে কী করব? দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তর : পরিমাণ বলটা কঠিন। আপনার জানের মূল্য আপনি নিজে ঠিক করে নেবেন, যে-আমি যদি ভালো থাকি, সুস্থ শরীরে সব কাজকর্ম সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে এর মূল্য কত হতে পারে। সে অনুসারে আপনি দান করবেন।

মনে রাখতে হবে, দায়সারাভাবে কোনোরকম একটা কিছু দিয়ে দায়িত্ব শেষ করার মতো বিষয় এটা নয়। অসুস্থ হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ফিস দিচ্ছেন হয়তো এক থেকে দেড় হাজার টাকা, কখনো তার চেয়েও বেশি। অথচ নিরাময়ের নিয়তে আপনি দান করলেন ১০ টাকা! এটা কোনো সদকা বা দান হলো না। দেড় হাজার টাকা হয়তো চিকিৎসকের ফিস, তাহলে দেড়শ টাকা তো অন্তত সদকা দেবেন। তবেই না এটা দান হবে।

আসলে এই বোধটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দান কোনো ভিক্ষা নয়। স্রষ্টার রহমত ও সামগ্রিক কল্যাণকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার অন্যতম প্রক্রিয়া হলো সৎ ও আন্তরিক দান।

আপনি যদি নিয়মিত দান করতেন, তবে এমনও হতে পারত যে, অসুস্থ হয়ে দেড় হাজার টাকা ডাক্তারকে দিতে হতো না। এর পরে বিভিন্ন রকম টেস্টের কথা বাদই দিলাম।

অতএব মনে রাখবেন, সদকা বা দান আপনার নিজের কল্যাণের জন্যেই। তাই জান-ই সদকার পরিমাণটা আপনি নিজের তৃপ্তি অনুসারে দেবেন, যে-আল্লাহ, আমি দান করছি। তুমি আমাকে ও আমার পরিবারকে সবসময় সুস্থ রাখো, ভালো রাখো, বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত রাখো।

প্রশ্ন : আমি বুয়েটে পড়ি, চতুর্থ সেমিস্টারে। প্রথম তিনটি সেমিস্টারে মোট ১৫টির মধ্যে ১৩টি সাবজেক্টে আমি ফেল করেছি। আমি আমার জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছি, এটাই আমার ব্যর্থতার কারণ মনে হয়। বিদেশ যেতে আপনি নিষেধ করেছেন। আবার বিসিএস দিলে এত অঙ্ক করতে হয়, যা মিনিংলেস। আমার কী করা উচিত? আমি খুবই হতাশ। কোর্স করেও ফল পাই নি। দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : প্রথমত, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স কোনো ম্যাজিক নয়। এটা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পথ দেখায়। আর আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকেই পরিবর্তন করতে হবে। আপনার জীবন গড়ার দায়িত্বটা আপনার নিজের। আপনি ১৫টির মধ্যে ১৩টি বিষয়ে কীভাবে ফেল করলেন? তাহলে পাশ করলেন কীসে?

আর বিদেশে যেতে তো আমি কখনো নিষেধ করি নি। এক্ষেত্রে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বিদেশে কেন যাবেন তা আপনার কাছে পরিস্কার থাকতে হবে। আমরা বলি, সারা পৃথিবী আমার। কিন্তু কী আমার, কতটুকু আমার, সেটা জানতে হবে।

আসলে আমাদের সমস্যাটা হলো, নিজের অলসতা অক্ষমতা ব্যর্থতাকে আমরা সবসময় অন্যর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই। আমি কি পরীক্ষায় ফেল করতে বলেছি? আমরা তো সবসময় বলি যে,

একজন শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হবে ক্লাসে প্রথম হওয়া। বিদেশে যাওয়া আর বিসিএস পরের কথা। আগে তো পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আপনার প্রশ্নটা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি হয় প্রেমরোগে আক্রান্ত হয়েছেন অথবা কোনো আসক্তিতে জড়িয়ে পড়েছেন। তা না হলে বুয়েটে ভর্তি হতে পারে যে শিক্ষার্থী, সে এতগুলো বিষয়ে ফেল করে কীভাবে? ফেল করারও তো একটা সীমা থাকবে।

যে শিক্ষার্থী ক্লাসে প্রথম সারিতে থাকার জন্যে চেষ্টা করবে না, সে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট থাকারই যোগ্য না। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যে শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে, সেখানে প্রথম হওয়ার যোগ্যতাও তার রয়েছে। এর পাশাপাশি কোয়ান্টামের শিক্ষাকে যদি কাজে লাগান, আপনি অবশ্যই সবক্ষেত্রে প্রথম সারিতে থাকবেন।

অতএব নিজের আলস্য আর আসক্তিকে চিহ্নিত করুন। এখন আপনার পড়ার সময়, পড়ায় মনোযোগ দিন এবং ক্লাসে প্রথম হওয়ার চেষ্টা করুন। পড়াশোনায় ভালো করতে শুরু করলে জীবনের লক্ষ্যটাও আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আপনি যে এতগুলো বিষয়ে ফেল করেছেন, এজন্যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে এক হাজার বার কান ধরে উঠ-বোস করবেন। নিজের ভুলের জন্যে নিজেকেও শাস্তি দিতে হয়। তাহলেই আপনি ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি ঘুমের মধ্যে চমকে উঠি। মনে হয় পড়ে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙে যায়। আমার বার্ষিকের ভয় হয়। বয়স হয়ে গেলে কেউ আগের মতো দাম দেয় না। সবাই অবহেলা অবজ্ঞা আর করুণা করে, এটাই মনে হয়।

উত্তর : আপনি বুড়ো হলে মানুষ কী করবে, সেটা নিয়ে এই তরুণ বয়সে এত ভেবে কী করবেন? আপনি বরং কাজে মনোযোগ দিন। কর্ম যদি ভালো হয়, তাহলে বয়স যত বাড়তে থাকবে আপনার কদর, আপনার সম্মান তত বাড়তে থাকবে। সম্মান কাজ দিয়ে বাড়ে, দুশ্চিন্তা দিয়ে নয়।

আপনি কাজ করুন, মানুষের জন্যে কাজ করুন। তাহলে দেখবেন, আপনার কোনো ভয় বা আশঙ্কা আর থাকছে না। সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন ও যোগব্যায়াম চর্চা করুন। এই যে ঘুমের মধ্যে চমকে ওঠা, ‘পড়ে যাচ্ছি’ মনে হওয়া, স্নায়বিক দুর্বলতাও এর একটি কারণ হতে পারে। যাদেরই স্নায়বিক দুর্বলতা আছে, ফিজিক্যাল ফিটনেস কম, তারা লামাতে ৪০ দিন খেদমতায়নে চলে যাবেন। আপনার জীবনটা ডিসপ্লিনড হয়ে যাবে। আপনার ফিটনেস বাড়বে।

এ মাসের অটোসাজেশন

নিজের দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন

করাই সবচেয়ে বড় দেশপ্রেম।

আমি দেশপ্রেমিক।

রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে কোয়ান্টাম ইয়োগা



রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার প্রাঙ্গণে কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা করছেন ১,১০৬ জন নবনিযুক্ত নারী পুলিশ কনস্টেবল।

রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ২২ ও ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে কোয়ান্টাম ইয়োগা প্রশিক্ষণ। ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমে অংশ নেন ১৮ তম টিআরসি ব্যাচের নবনিযুক্ত ১,১০৬ জন নারী কনস্টেবল।

সুস্থতার জন্যে কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চার পাশাপাশি সঠিক জীবনদৃষ্টি, পুষ্টিসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়ামচর্চার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন অর্গানায়ার ফেরদৌসী সুলতানা। এর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত তিনটি ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শিত হয়। এগুলো হচ্ছে সেলফি সিনড্রোম, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়ে সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি থেকে মুক্তি, অতিরিক্ত বসে থাকার বিভিন্ন ক্ষতিকর ও স্বাস্থ্যঘাতী দিক নিয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও।

ইয়োগা প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে কনস্টেবল সুইটি আক্তার বলেন, আমার কাছে এই প্রশিক্ষণ খুবই বাস্তবধর্মী মনে হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের জন্যে নিয়মিত কোয়ান্টাম ইয়োগা চর্চা খুব জরুরি। বিশেষভাবে বলতে চাই যে, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন অটোসাজেশনটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। এখন থেকে প্রতিদিন আমি এটি চর্চা করব।

কনস্টেবল সোমা রানী দাস বলেন, সুস্থ থাকার জন্যে আমাদের কী ধরনের খাবার খেতে হবে তা এ প্রোগ্রাম থেকে জানতে পারলাম। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছি মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনে। জীবনে সফল হতে হলে মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে।

উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন প্রকাশিত রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটিকে সম্প্রতি এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচিত করেছে রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ। প্রশিক্ষার্থীরা এ বইটি ছাড়াও অন্যান্য কোয়ান্টাম প্রকাশনা সংগ্রহ করেন।

রাজশাহী ও নবীনগরে মোবাইল ফোন বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার



রাজশাহীর প্যারামাউন্ট স্কুলে 'মোবাইল ব্যবহারে সতর্কতা' শীর্ষক ভিডিও দেখছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ

১ নভেম্বর রাজশাহীর প্যারামাউন্ট স্কুল এন্ড কলেজে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার রোধে সচেতনতামূলক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকসহ ১৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠানে বিএসএমএমইউ-এর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত মোবাইল ব্যবহারে সতর্কতা বিষয়ে যে আলোচনা উপস্থাপন করেন, তার নির্বাচিত অংশ সেমিনারে প্রদর্শন করা হয়।

২৩ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে তরুণদের মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট অপব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সেলফি সিনড্রোম, আসুন সুস্থ থাকি-সহ কয়েকটি সচেতনতামূলক ভিডিও প্রদর্শিত হয়।

এতে নবীনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দসহ মোট ৫২ জন অংশ নেন। সমাপনী বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন সরকার।

নার্সিং কলেজে মেডিটেশন সেমিনার



৬ নভেম্বর নার্সিং কলেজে (সেবা মহাবিদ্যালয়, মহাখালী) একটি মেডিটেশন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন অর্গানায়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। আলোচনার পাশাপাশি দুটি ভিডিও ডকুমেন্টারির মাধ্যমে মেডিটেশনের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন লালবাগ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এ সেমিনারে সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসহ ২৩৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অংশ নেন। এ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হলেন সারাদেশ থেকে নার্সিংয়ে উচ্চতর (বিএসসি) প্রশিক্ষণ নিতে আসা সেবিকা বা নার্স। কোয়ান্টামকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী বক্তব্য দেন সেবা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডা. জাসিন্তা অলিম্পিয়া গোমেজ।

১৩৮ ও ১৩৯ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান রক্তদাতাদের প্রতি দেশ ও জাতি কৃতজ্ঞ



বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.-এর চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমেদ চৌধুরীর কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

গত ২৫ অক্টোবর ও ৮ নভেম্বর কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননার ১৩৮ ও ১৩৯ তম আয়োজন। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন ২১১ জন আজীবন রক্তদাতাকে এসব অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

১৩৮ তম আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি, রক্তদাতারা নিঃসন্দেহে সাহসী। কারণ শরীরের কোনো অংশ একটু কেটে অল্প রক্তক্ষরণেই মানুষ ভয় পেয়ে যায়। অথচ রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় নিয়মিতভাবে রক্তদান করছেন। তারা নিঃস্বার্থভাবে মুমূর্ষু মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছেন।

স্বেচ্ছা রক্তদাতারা যদি অন্যদেরও রক্তদান

করতে উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে আমাদের দেশের রক্ত চাহিদার পুরোটাই মেটানো সম্ভব হবে। তখন আর কাউকেই পেশাদার রক্তদাতাদের দূষিত রক্ত নিতে হবে না। আর এই মহৎ কাজে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকেও ধন্যবাদ জানাই।’

১৩৯ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.-এর চেয়ারম্যান ড. রশিদ আহমেদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, ‘আজকের এই আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে রক্তদাতারা যেভাবে মানুষের জীবন বাঁচাতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন, তা এককথায় অমূল্য। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত পাঁচ বার



১৩৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল

ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আমাদের ব্যাংকের কিছু সদস্যও এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের এ অগ্রযাত্রায় আমি গর্বিত।’

এ দুটি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদানের প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারী। তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, ‘রক্তের বিকল্প রক্তই। এখন পর্যন্ত এর বিকল্প আবিষ্কার হয় নি। প্রভুর করুণায় আপনারা শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন বলেই রক্তদানের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করতে পারছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত-সৃষ্টির সেরা। আর সৃষ্টির সেরা এই মানুষকে বাঁচাতে রক্তদাতারা এগিয়ে এসেছেন। এর মধ্য দিয়ে মানবিকতার বাস্তব উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তারা। আমাদের দেশ ও জাতি রক্তদাতাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’

সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রত্যেক রক্তদাতাকে সম্মাননা সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও বিশেষ ট্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারি দ্রুপ থেকে কবর প্রদর্শনীর মাধ্যমে শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান দুটির সমাপ্তি ঘটে।

ব্লাড ক্যাম্প



ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ১১ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নগর ভবনে ২৮ নভেম্বর স্মরণসভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাদ্দিক খোকনের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় দিনব্যাপী রক্তদান ক্যাম্প



ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে গত চার অক্টোবর দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। লায়স ক্লাব অব ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজ ও কোয়ান্টাম বনশ্রী সেন্টারের সহযোগিতায় আয়োজিত এ ক্যাম্পে ৫২৭ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এতে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ডিসেম্বর ২০১৭ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd